International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.146-157
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.146-157

দলিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদান

ড.নেপাল বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

Abstract:

Harichand was born on 1812. He realized in his self-realization that a religion was needed to organize and organize these irreligious people from celibacy and Brahminical intrigues. So he founded the 'Matua' religion in 1830 at the age of only 18 for these irreligious fallen in the ideology of Buddha.

He started a struggle to free the Brahmins from their grip. He declared -

"eat the dog's leftover prasad even if you get it.
Vedic rules do not follow toilet."

That is, I am willing to eat this dog food, but I do not follow the Vedas and their rules or principles. Harichand Tagore's movement started with this announcement. A platform form of movement was created for the then untouchables.

All people were equal to him. Although he used religion as a tool in his movement, he did not cling to religion but proceeded to establish the religion of humanity. So another key word of his religion is 'Hate Kam Mukha Naam'. That is, karma is religion.

Keyword: Matua, Harichand Thakur, Matua Darshan, Namasudras, Vaishnavism, Depressed Class, Untouchables.

Discussion: যে বোধোদয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ১৯০১ সালে ধরা পড়েছিল, তারও বহু বছর আগে বৃহত্তর বাঙলার জনজীবনের বিস্তৃত পরিসরে তা-ই প্রসারিত করার কাজে ব্যাপক। এক ভূমিকা পালন করেছিলেন ঠাকুর হরিচাদ যাঁর জন্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় অর্ধশত বর্ষ আগে হয়েছিল ১৮১২ সালে প্রান্তিক বাঙলার এক অখ্যাত গাঁয়ে। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, একথা বলে রবীন্দ্রনাথ জগৎ থেকে পালাতে চাননি, সংসার থেকে সরে যেতে চাননি দূরে। বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, "যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে; প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া, ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধন বলি।" রবীন্দ্রনাথ যখন এই ভাবনা ভাবতে বসেছেন,

তার প্রায় পৌনে একশত বছর আগে নিতান্ত বালক বয়সে ঠাকুর হরিচাদকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা গেছে বৈষ্ণবদের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসব্রতী হওয়ার বিরুদ্ধে । হরিচাদের পিতৃদের যশোবন্ত ঠাকুর ছিলেন একান্ত বৈষ্ণব ভক্তপ্রাণ মানুষ। বৈষ্ণবদের পদসেবায় আত্মনিবেদিত, জগৎ ও সংসারকে অসার ভেবে নিয়ে, বৈরাগ্যকে করে নিচ্ছেন তিনি মুক্তির সারাৎসার বিষয়। সে ভাবনায় ঘর ও সংসারের বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মায়া মুক্ত হলে, পিছনের টান কাটলে তাদের কাছে উন্মুক্ত হয় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানর দরজা। সেই মুক্ত আগল পথে ঈশ্বরকে খুঁজতে গিয়ে বৈরাগ্যের মধ্যে জীবনের মাহাত্ম্য দেখতে পেয়েছিলেন যশোবন্ত ঠাকুর। পিতৃদেব যশোবত্তের সাথে সহমত পোষণ করেননি কিশোর বয়সের হরিচাঁদ। হরিচাদের জীবনচরিতের ভাষ্যকার তারকচন্দ্র সরকার লিখলেন তাঁর কথা এইভাবে:

‘‘মালা-টেপা ফোঁটা কাটা জল-ফেলা নাই।
হাতে-কাম, মুখে নাম, মন-খোলা চাই।।
সহজ গার্হস্থ্যধর্ম সর্বধর্ম সার।
গৃহীকে বিলা’বে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।’’[1]

ঠাকুর হরিচাদ যে মুক্তির বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছেন সে মুক্তি বৈরাগ্যের মধ্যে মুক্তির সন্ধান নয়। সে মুক্তি সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সকল ধর্মের সার, গৃহী জীবনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান।

কর্ম থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি, ঘর-সংসার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিবাগী হওয়ার বাসনা ঈশ্বর সাধনায় এক দর্শন তত্ত্ব হয়ে ভারতবর্ষে বিরাজিত ছিল প্রায় চারশ’ বছর ধরে। ভারতের এই বৈষ্ণব ধারার দর্শন তত্ত্ব অতীত ঐতিহ্যের পরম্পরায় অহঙ্কারের বিষয় হয়ে বিরাজিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে কোনও এক সময়ে এমনি মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, ‘‘বৈষ্ণব কাবাই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝর্ণা বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না।‘‘[2]

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকে ভারতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হতে পেরেছিল ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় আচার-আচরণে অজস্র বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল সমাজে। বর্ণ বিভাজিত সমাজে এক বর্ণের মানুষের সাথে অন্য বর্ণের মানুষের কোনও প্রকার আত্মীয়তা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। ছোঁয়াছুয়ি এমনকি একসাথে ওঠাবসাও চালু ছিল না সমাজে।

বিভাজিত জনসত্তার অন্ত্যজ সমাজের মানুষের হৃদয়ের গ্লানি চাপা পড়েছিল ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ভক্তি আন্দোলন তদানীন্তন অস্পৃশ্যতার অনড় শরীরে কিছুটা ছায়াপাত ঘটাতে পারলেও এর মূলে নাড়া দেবার শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

ঈশ্বরের পথে পথিক হওয়ার মধ্যে সমাজটাকে ভেঙেচুরে নতুন পথের দিশা দেবার কোনও ঈঙ্গিত ছিল না। রবিদাস কিংবা তুকারাম অস্পৃশ্য সমাজের হয়েও ছিলেন ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। অভিযোগ ছিল না কারও বিরুদ্ধে কোনও। ভক্তিকে আত্মস্থ করেই সকল অভিযোগের ঊর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। সুরদাসের কণ্ঠে। উচ্চারিত হতে শোনা গেছে একপ্রকার আত্ম-পীড়নের যন্ত্রণা:

অতি অসহন বহিদহন

মর্ম মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাছ প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্লাস।[3]

অস্পৃশ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন যা নিতে পেরেছিল। তা হল এই যে, অশিক্ষা দারিদ্র সামাজিক বৈষম্যের বহুবিধ যন্ত্রণা ভুলে যেতে সাহায্য করেছিল। পেটের ক্ষুধা নিয়ে কোনও কথা মুখে উচ্চারিত হয়নি, নিরক্ষরতার অভিশাপ নিয়ে মাথা ব্যথা হয়নি। সমাজ জীবনের বাইরে গিয়ে হীনভাবে জীবন-যাপন করার কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিতে পেরেছিল। ভক্তিবাদ মূলত সকল জাগতিক যন্ত্রণা ভুলে যাবার এক আশ্চর্য রকমের যন্ত্রণা নিরোধক ঔষধ।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে সাহিত্য ছিল রাজপ্রাসাদের করুণা বিগলিত ফসল। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য তার স্বর্ণযুগ তৈরি করেছিল রাজসভার বেতনভুক কবিদের অবদান দিয়ে। বাংলা সাহিত্যও অনেকখানি হেঁটেছিল সেই পথে। সেন রাজত্ব কালে লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' লিখে ভক্তি ও ভাবের এক শীর্ষে অবতরণ করেছিলেন। পাল রাজাদের অন্যতম ছিলেন রামপাল প্রায় চারশ বছর বাঙলার সিংহাসন ছিল পাল রাজাদের দখলে। রামপালের সভাকবি রাজার গুণকীর্তন করে সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছেন 'রামচরিত' কাব্য। 'গীতগোবিন্দ' দিয়ে যে ভক্তিবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল তা এক চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারায়। এই ভাবধারার মধ্যে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ-কথা ছিল না, ছিল না তাঁদের দুর্গতি লাঘবের চেষ্টা। ঠাকুর হরিচাদ হলেন শ্রীচৈতন্যের বিকল্প সাধক। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষের মুক্তির দিশারি। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব বা বৈষ্ণববাদ নস্যাৎ করে তিনি বললেনঃ

চৈতন্যের তত্ত্ব যাতে কেহ নাহি মানে।
শিখাইৰ এই তত্ত্ব সুযুক্তি বিধানে।।[4]

ভাবাবেগে নয়, ভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে নয়, অলিগলি থেকে মণি ছিল যার দখলে, তিনি ঠাকুর হরিচাদ। শ্রীচৈতন্য আগের দেহ কোল' বলে সাম্যের বাণী মুখে উচ্চারণ করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে। দেখা গেছে তিনি কায়স্থ বাড়ি অবদি নেমেছেন। ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে কায়স্থ বাড়িতে গিয়ে পা রাখা ছিল সেকালের এক কঠিন কাজ। তিনি ততটা অবদি করেছেন বরং বলা ভালো করতে পেরেছেন দুঃসাহসে ভর দিয়েই করেছেন তা। শুভ্র বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার। দুঃসাহস দেখান নি। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি আদপেই তা করেননি। আচণ্ডালে রোজ দেওয়ার কথা তাঁর কেবল কথার কথা। তিনি তো মুখে বলা কথা বাস্তবে রূপ দিয়ে কৌলীন্য ভাঙার অগ্রগণ্য পথিক হিসাবে নিজেই নিজের প্রমাণ হতে পারতেন কিন্তু তা হলেন না কেন? এখানেই শ্রীচৈতন্যের সীমাবদ্ধতা—বৈষ্ণববাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূর্ণাঙ্গভাবে পালনের অভাব ও অক্ষমতা কবি তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন স্রষ্টা এবং স্রষ্টা। সেই অভাব অনুভূত হল তাঁর কাছে। খালি চোখে দেখতে পেতেন অনেকদুর অবদি এবং কাব্য রচনা করলেন সেইভাবে। বৈষ্ণববাদের সীমাবদ্ধতা এবং শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডালে বুকের প্রেম বিলিয়ে দেওয়ার অক্ষমতার কথা তিনি লিখলেন—

এ লীলা হইল সাঙ্গ, আমার গৌরাঙ্গ অঙ্গ,
মিশে গেল আমার শরীরে।।
এবে না পাইবে দেখা, গুরুজন শিষ্য শাখা,
স্থির কর শোক মন।

কলির মধ্যাহ্ন কালে, করিব একটি লীলে,
তারপরে পা'বে দরশন।।[5]

শ্রীচৈতন্য যা করে দেখাতে পারলেন না, তা করে দেখাবেন এমন মানুষের দেখ পাওয়া যাবে। তিনি জন্মাবেন। শ্রীচৈতন্যের সকল গুণ নিয়ে। তিনি জন্মাবেন কলির মধ্যাহ্নকালে। তিনি জন্মাবেন শূদ্রবর্ণে। সবারই থাকে নিজস্ব গণ্ডি। বৈষ্ণববাদের মহান গুরু চৈতন্যেরও ছিল আপন গণ্ডি। তিনি তাঁর লীলা সেই গণ্ডির মধ্যেই শেষ করলেন এই গণ্ডির আলোক বর্তিকা অপরাজেয় পরাভবে অন্য আরেক শরীরে হয়ে ওঠে। অস্তিমান। কলির মধ্যাহ্নকালে সেই অস্তিমান হয়ে ওঠা—সেই নতুন কায়া অপূর্ণ থেকে পূর্ণত্বে পদার্পণ। খণ্ড থেকে অখণ্ডে পৌঁছে যাওয়া ব্রহ্মা থেকে পূর্ণব্রহ্ম হয়ে ওঠা। যাঁকে হারাই তাঁর জন্য কষ্ট পাই—শ্রীচৈতন্যের লীলা সাঙ্গ হওয়ার মধ্যে আছে। কষ্ট—হারানোর কষ্ট। সেখানে গুরুর শিষ্য শাখা হয়ে পড়েন শোক সন্তপ্ত। পূর্ণতা। পাওয়ার মধ্যে অতীতের মালিন্য মোছে—মুছে যায় অতীতের কষ্ট। এইভাবে একেকটা শোক সাগর পেরিয়ে যে যাওয়া তার মধ্যে থাকে নতুন পাওয়ার আনন্দ-চলমানতার মহা সত্য। বৈষ্ণবকাল পিছনে ফেলে কবিভাষ্যে ঠাকুর হরিচাদের চলমানতা ফুটে ওঠে। এইভাবে:

মানুষে আসিয়া, মানুষে মিশিয়া,
করিব মানুষ লীলে।
সেই ত সময়, পাইবে আমায়,
পুনশ্চ মানুষ হলে।[6]

কবি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন ঠাকুর হরিচাঁদ ছিলেন পিতামাতার সন্তান। যে কোন মনুষ্য সন্তানের প্রথম পরিচয় তার মানুষের পরিচয়। অতি মানুষ না হয়ে ওঠা। অথচ তাবৎ হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের মর্মোদ্ধার করে যে সত্য মেলে তা বলে ভিন্ন কথা। শ্রীচৈতন্য কলিযুগের অবতার— ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র—দ্বাপরের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীচৈতন্য নিজেকে কখনও মানুষের পরিচয়ে প্রতিভাত হননি—প্রতিভাত হয়েছেন ঈশ্বরের পরিচয়ে। ঠাকুর হরিচাদের সাথে এখানেই তাঁদের অমিল। কবিভাষ্যে স্পষ্টকরে শুনিয়ে দেওয়া হয়—'মানুষে আসিয়া, মানুষে মিশিয়া, করিব মানুষ লীলে। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের থেকে, শ্রীকৃষ্ণের থেকে, শ্রীচৈতন্যের থেকে ঠাকুর হরিচাদ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন।

এই ভাবনার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের। ঈশ্বরমুখি না হয়ে মানবমুখি হওয়া প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। বুদ্ধের দর্শনে ঈশ্বর আছে কি নেই তার মীমাংসা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। বুদ্ধ-ভাবনায় ব্যক্তি কল্যাণের পরিবর্তে 'বহুজন হিতায়' অর্থাৎ বহুজনেরর হিতের কথা, বহুজনের কল্যাণের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। গৌতমবুদ্ধ তো নিজেই উক্তি করে গেছেন, মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। আমাকে আবার অবতার বা দেবতা বানিয়ে মন্দিরে বসিয়ে দিও না। হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আবহাত হওয়ার বিষয় তিনি আগাম ভেবেছিলেন, তা অনুমান করা যায়। মানুষের মানুষ হয়ে থাকার এই যে- বাসনা, মানুষের অভিমানুষ বা অবতার 'না' হয়ে ওঠার এই যে-কামনা, সর্বজনের কল্যাণকামী হওয়ার এই যে-নিবেন—এদিক থেকে গৌতমবুদ্ধের সাথে ঠাকুর হরিচাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

যেকথা গুরুত্ব দিয়ে বলার কথা, অবতারত্বের কাহিনীতে ব্যতিক্রমী সত্তা ঠাকুর হরিচাদ। কেন তিনি ব্যতিক্রমী? কেন তিনি রাম-অবতারের সাথে তুলনীয় নন? কেন তিনি কৃষ্ণ-অবতারের সাথে তুলনীয় নন?

কেন তিনি চৈতন্য-অবতারের সাথে তুলনীয় নন? শ্রীরামচন্দ্র জন্মের অধিকারে ছিলেন ক্ষত্রিয়। বর্ণাহঙ্কারী। আর বর্ণাহঙ্কারী ছিলেন বলেই বর্ণাধিপত্য কায়েমে রাখার প্রকৃত রূপকার তিনি। কোনও শূদ্র যখন শূদ্রের দাসত্ব-পেশা ত্যাগ করে তপশ্চারন করতে চেয়েছে, আয়ত্ব করতে চেয়েছে ব্রাহ্মণের পেশা, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে শাস্তি দিয়েছেন তাকে। কোনও যুগে কোনও কালে শূদ্রদের পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের নিজের হাতে শম্বুক নিধনের ঘটনা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আগামী দিনেও তা সম্ভব হবে না, ধরে নেওয়া যায়। ত্রেতা পার হয়ে দ্বাপরে-ও সেই একই ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে ভারতে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মের অধিকারে ক্ষত্রিয় কুলের যদিও তিনি শৈশবে লালিত-পালিত হয়েছেন নিম্নবর্ণ পরিবারে। মহাভারতে দেখা গেছে, একলব্য নিজের একনিষ্ঠ সাধনায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন, আয়ত্ব করেছেন ক্ষত্রিয়ের পেশা। গুরু দ্রোণাচার্য তাঁকে ক্ষত্রিয়ের পেশা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন গুরুদক্ষিণার অছিলায় একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভর সভায় সুতপুত্র কর্ণ যাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে দূর থেকে ইশারা করে বলে দিয়েছেন সেকথা—কর্ণ সূতপুত্র, ছোটজাত। কর্ণকে ক্ষত্রিয়ের পেশা দখলে থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কলিযুগের ইতিহাসেও অতীতের ঐতিহ্য বর্তমান থেকেছে। বৈষ্ণব-গুরু চৈতন্যদেব কোনও শূদ্র বাড়িতে গিয়ে মেলামেশা করেছেন, এমন কোনও উদাহরণ হাতের কাছে মেলে না। বৈষ্ণব ধর্মের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তার থেকে উৎক্রমণের পথ বলে দিয়েছেন। ঠাকুর হরিচাদের জীবনীকার তারকচন্দ্র সরকার। কি বলেছেন তিনি? তিনি বলেছেন, এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হরার পথ হল একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব এবং সে কাজ করতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন ঠাকুর হরিচাদ।

এরূপে বৈষ্ণব ধর্মে পড়ে গেল ত্রুটি।
সেহেতু ঘুচাতে বৈষ্ণবের কুটিনাটী।।
যুগে যুগে করে প্রভু ভূভার হরণ।
দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপন।।[7]

বৈষ্ণববাদকে অতিক্রম করে এক নতুন পথের দিশারি ঠাকুর হরিচাদ। তিনি প্রচার করলেন একটি নতুন ধর্ম মতুয়া ধর্ম—নতুন এক পথে চালনা করলেন ভক্তিবাদ দর্শনকে। ভক্তিবাদ থেকে বৈরাগ্যের চেতনা বা তত্ত্বের অংশ সরিয়ে দিলেন দূরে এবং দূরে সরিয়ে তিনি যেখানে যুক্ত করলেন শ্রমশীল হওয়ার তত্ত্ব কর্মশীল হওয়ার বাণী।

এদিয়ে তিনি হরণ করতে চেয়েছেন 'ভূভার'। এই ভূভার কি? এ-ভূভার হল পৃথিবীর এক অত্যন্ত জরুরিসমস্যা। ভারতবর্ষ সাধুসন্ন্যাসীর দেশ, একথা বলার ভিতর দিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীকে এক আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে দেখা যায়। উপনিষদের বাণী 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথা,' এই বাণী তাদের সকলের হৃদয়, মন ও আত্মাকে মথিত করে। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করার মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। কিন্তু যার আছে সে-ই তো পারে ত্যাগ করে মহত্ব দেখাতে। যার নেই, সর্বহারা, এদেশের নিপীড়িত জনসত্তা, নিঃস্বতার এক চরম অবস্থানে দাঁড়িয়ে, পেটে খাবার জোটে না, অশিক্ষায় ভুগছে, পরনে বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই – ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের দর্শন তার কাছে কোনও অর্থ বহন করে কি? সাধু-সন্ন্যাসীর দেশের জনগোষ্ঠী হওয়াতে নিম্নবর্ণের সন্তানদের এবং তার সাথে নিঃস্ব জনতার দুর্গতি দিন দিন বাড়ে ছাড়া কমে কি? সাধু-সন্ন্যাসীরা কোনও প্রকার উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকেন না। তাঁরা নিজেরা কোনও প্রকার উৎপাদন না করে সমাজে যাঁরা উৎপাদন করেন তাঁদের উৎপাদনে ভাগ বসান। এদিয়ে দরিদ্র দেশে আরও দাবির বাড়ে। তাই

উৎপাদনহীনতার বিরুদ্ধে পাঁড়িয়েছেন ঠাকুর হরিচাদ আর্থিক স্বয়স্তবতার মন্ত্র নিয়ে — উৎপাদনশীল হওয়ার যুক্তি নিয়ে। পেটের অন্ন জোগাতে না পারলে কিসের ধর্ম? সে কারণেই ধর্মকে তিনি কর্মমুখি করেছেন। দারিদ্র মুক্ত হতে, আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে।

ঠাকুর হরিচাদের কথা বলতে গিয়ে এদেশের আরেকটা ভাববার বিষয় হল মুনি- ঋষিদের কথা। মুনি-ঋষিরা সকলেই ব্রাহ্মণ কুলের। অগস্ত্য, বশিষ্ট, পুলস্ত্য, ভার্গব, পুলহ, পুলোমা, শুক্রাচার্য, কাশ্যপ, কপিল, পরশুরাম ইত্যাদি নামের শতসহস্র মুনি- ঋষিরা এদেশে জন্মেছেন। তাদের অবদানে উজ্জ্বল হয়েছে ভারতের মুখ। এই সকল মুনিঋষিদের মধ্যে আরও দুটি নাম বাল্মীকি ও ব্যাস—দুজনেরই জন্ম নিম্নবর্ণে, অস্পৃশ্য সমাজে। দস্যুবৃত্তি থেকে রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছেন, তেমনি সময়ের কোনও একদিনে বনবিহারে অবলোকন করছিলেন ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর মিথুন দৃশ্য। এমনি সময়ে ব্যাধের শরাঘাতে নিহত হল তাদের একজন। প্রিয়জন হারাবার ব্যথা স্পর্শ করেছিল বাল্মীকিকে। ভারত জননীর প্রথম সন্তান, যাঁর কণ্ঠে কাব্য রচনার প্রথম শ্লোক—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং বলে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল, তিনিই বাল্মীকি - মহর্ষি বাল্মীকি, রচনা করেছেন প্রথম মহাকাব্য। প্রথম মহাকাব্য 'রামায়ণ' যেমন এক শূদ্র কবির রচনা, তেমনি মহাকাব্য 'মহাভারতের' রচনাকারও এক শূদ্র কবি—মহর্ষি ব্যাস, মৎস্যজীবী ঘরের কন্যা মৎস্যগন্ধার সন্তান। ওড়িষ্যার কোনও একটি অঞ্চলের মৎসজীবীদের মধ্য মৎস্যগন্ধাকে স্মরণ করে আজও পালিত হয় উৎসব। আধুনিক সমাজে ছোট হয়ে জন্মানো মানুষদের ছোট করে রাখার প্রবণতা লক্ষিত হয় যখন, তা হয়ে ওঠে দুঃখের কারণ। এমনটা দেখেশুনে তারকচন্দ্র সরকার তাই শুনিয়েছেন।

কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কিবা যোগী হয়।
যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়।।[৪]

আত্মতত্ত্ব জানার ভিতর দিয়ে কবি হয়ে ওঠেন প্রকৃত কবি, শিল্পী হয়ে ওঠেন প্রকৃত শিল্পী, গল্পকার প্রকৃত গল্পকার, ঔপন্যাসিক প্রকৃত ঔপন্যাসিক। আত্মতত্ত্ব না জানলে সৃজনশীলতায় শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না। সাধক হতে পারেন না শ্রেষ্ঠ সাধক, ধর্মকার হতে পারেন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক। যে সমাজ ও বর্ণে জন্মেছিলেন ঠাকুর হরিচাদ তিনি তাঁর সমাজ ও বর্ণ সম্পর্কে ছিলেন এক তুলনাহীন আত্মদর্শী মানুষ - মহামানব, নিজের প্রজ্ঞা ও সাধনায়, ঐশীশক্তি ও মহিমায় সেই সমাজকে দিয়েছেন উত্থানের স্বপ্ন-পতিতত্ত্ব মোচনের অমোঘ মন্ত্র।

ঠাকুর হরিচাদের জন্মের ঠিক বার বছর পরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মেছিলেন মধুসুদন দত্ত। ঠাকুর হরিচাদের জন্ম যে-ফরিদপুর জেলায়, তারই পশ্চিম সীমানা ছুঁয়ে যশোহর জেলা। মধুসূদন জন্মেছিলেন যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ির এক কুলীন জমিদার কায়স্থ পরিবারে। অধ্যাপক ডিরোজিও-কে কেন্দ্র করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে হিন্দুধর্মের অন্ধতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। যা মূলত 'বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন' নামে খ্যাত। জাতিভেদ বর্ণভেদে জর্জরিত হিন্দুধর্মের সাথে অনেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রকৃতিরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। মধুসূদনের কথা স্মরণ করা এই কারণে যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমুল পরিবর্তন ঘটেছিল। 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য রচনায় হাত দিলেন তিনি। তার মহাকাব্যে রামচন্দ্র নয়, এদেশের এক আদিকালের মূলনিবাসী সন্তান রাবণ প্রতিষ্ঠিত হলেন বীরের মর্যাদায় বীর রসে ভাসি গাহিব মা মহাগীতি বলে একদা যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এক নবচেতনার কথা, আর্যতনয় রামচন্দ্রের থেকে অনার্যতনয় রাবণকে বড় করে দেখাবার যে ভাবনা, মধুসূদন হিন্দু থাকলে তা করতেন

কিনা, অথবা করতে পারতেন কিনা, খুব স্বাভাবিকভাবে সে প্রশ্ন মনে জাগে। আধুনিককালের এই সময়ে দাঁড়িয়েও রামের সাথে রাবণকে তুলামূল্যের মানুষ বলে ভাববার লোক কোথায়? সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে একপেশে দৃষ্টি দিয়ে তা কখনও সম্ভব হয় না। দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ করতে পেরেছিলেন বলেই মধুসূদন যেমন রামায়ণ ভিত্তিক মহাকাব্য রচনা করে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন বাঙালি সমাজকে, ঠাকুর হরিচাদ এক অস্পৃশ্য চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করেও প্রান্তজনের সুখের কথায় হতে পেরেছিলেন আত্মমগ্ন এবংসমাজের তলানি থেকে এক নতুন ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর দুঃখী জনগোষ্ঠীর মানুষের কল্যাণ পৌঁছে দিয়েছিলেন ঘরে ঘরে।

নীচ নীচ কুলে প্রভু দিয়া প্রেমধন।
নমঃশূদ্র কুলে এল ব্রহ্ম সনাতন ।।[9]

হরিচাদ নিজে এক আলাদা সত্তা—তিনি বাল্মীকিও নন, তিনি ব্যাসও নন, তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজও নন কিংবা নন বৃন্দাবন দাস। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ লিখতে গিয়ে রামলীলা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন কিন্তু শুদ্রবর্ণের প্রতি দুর্দশার কথা ভুলে যাননি। ব্যাস মহাভারত লিখতে গিয়ে কৃষ্ণলীলা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন কিন্তু শুদ্রবর্ণের প্রতি তদানীন্তন সমাজের অন্যায় আচরণের কথা ভুলে যাননি। পূর্ণব্রহ্ম হরিচাদ ভুবন পালক তাঁর লীলাকথা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন। তারকচন্দ্র সরকার এবং তিনি তা করেছেন কাব্যকারে।

মহাভারত লিখিল ব্যাস মুনিবর।
বাল্মীকি রহিবে বেঁচে যুগ যুগান্তর।।
প্রভুর এ লীলামৃত শেষ অবতার।
লিখিয়া তারক তুমি হইলে অমর।।[10]

ঠাকুর হরিচাদের মতুয়া ধর্ম ও দর্শন ব্রাত্য জনসাধারণের উত্থানে কিভাবে বীজমন্ত্র হয়ে কাজ করেছে তা বুঝতে গিয়ে প্রয়োজন হয় রাজা রামমোহনের সময় থেকে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে 'হাওয়া বদলের হাওয়া' কিভাবে প্রবেশ করেছিল সে-ইতিহাস বুঝে নেওয়া। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল — ১২০৬ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল অবদি — প্রায় সাড়ে পাঁচ শ বছর। তারপর এদেশে আগমন ঘটেছিল ইংরেজদের। কি ঘটেছিল তখন? ঠাকুর হরিচাদের জীবনীকার তারকচন্দ্র সরকার বলেন-

রাজশক্তি ইংরেজের শক্তিমত্তা গুণে।
যীশুর ধর্মের বাণী জানে সর্বজনে।।
ইসলাম বৌদ্ধ আদি যত ধর্ম আছে।
রাজশক্তি পোষনেতে টিকিয়া রয়েছে।।[11]

এটুকু বলে থেমে থাকেননি তিনি। এর সাথে সংযোজন করেছিলেন নিজের মনের আকুতি। মতুয়া ধর্ম ও দর্শনকে যদি টিকে থাকতে হয় তার জন্যে প্রয়োজন রাজশক্তির। রাজশক্তির কথা তিনি সংযোজন করলেন এইভাবে:

মম মনে এই আশা এ বংশ মাঝারে।
রাজশক্তি নিয়ে যেন কেহ জন্ম ধরে।।
প্রভুর একথা শুনি যত ভক্তগণ।

কাদিয়া আকুল সবে ভাসে দু'নয়াণ।।"[12]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে পূর্ব বাঙলার সফলডাঙা গ্রামে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তকের জন্ম। দীর্ঘকাল ইসলাম ও খ্রিস্টান শাসকদের অধীনে থেকে হিন্দুধর্ম তার পৌত্তলিকতা থেকে বহু দেবতায় বিশ্বাসের জায়গা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। বহু দেবতার জায়গায় একেশ্বরবাদের কথায় এবং পৌত্তলিকতার জায়গায় নিরাকার ব্রহ্মসাধনার কথা প্রথমে বলতে শুরু করেছিলেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ করেছেন। এবং বেদান্ত নিয়ে 'অ্যাব্রিজমেন্ট অব দ্য বেদান্ত' শিরোনামে গ্রন্থ ইংরেজিতে রচনা করেন। ইসলামের সাথে, খ্রিস্টান ধর্মের সাথে এদিয়ে সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মসমাজ। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু সহ সমাজের উঁচুস্তর থেকে অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র দু'জনেই ছিলেন বড় মাপের জমিদার। রামমোহনের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র এবং পিতা রামকান্ত উভয়েই ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী এবং রামমোহনের সময়ে তাঁদের জমিদারী আরও অনেক বড় হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি জমিদারেরা মিলে ১৮৩৮ সালে গঠন করেছিলেন 'জমিদার সংঘ', যাদের কাজ ছিল মূলত ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নেওয়া।

শহরের এই জমিদার কুলের কাছে গাঁয়ের কৃষক শ্রেণী ছিল শোষণের ক্ষেত্র। বর্ণ- ব্যবস্থার হাত ধরে সমাজের তলানীতে ছিল যাদের অবস্থান তাদের নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। উত্তর বৈদিক কালে যে অসম, অমানবিক, প্রবল এক শ্রেণীশোষণের উপরে মানুষের আর্থসামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল- শ্রেণীশোষণ ও বর্ণশোষণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল, তা রক্ষা করাই হয়েছিল তাঁদের কাজ। ব্রাহ্মণেরা চতুর্থণ্য প্রথার ঐশ্বরীয় কথা ঘোষণা করা ছাড়া, এই ব্যবস্থার মধ্যে অমানবিক প্রথাকে কোন প্রকারের তাত্ত্বিক আবরণে মুড়ে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে সক্ষম হননি। রামমোহনেরা মিলে যা করেছিলেন তা হল 'বেদান্তের প্রাচীন প্রবাহকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নবজীবন দিয়ে সে হিন্দুধর্মকে পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।"(জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকল্প নবজাগরণ) দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজিরাও মূর্তিপূজা বিরোধী ও বৈদান্তিক একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাদের অবদানেও বর্ণবিভাজিত সমাজের তলানিতে কোনও প্রকারের আলোকপাত ঘটেনি।

ঠাকুর হরিচাদের জন্মের দুই দশকের বেশি পরে হুগলির কামারপুকুর গ্রামে জন্ম হয়েছিল রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের। শৈশবের ডাকনাম গদাই। বেদান্ত দর্শনের নতুন এক ভাষ্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'যতো মত ততো পথ'। তাঁর তত্ত্বে আল্লা-হরি-যিশুর মধ্যে বিভেদ রইল না। একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের বহুত্বের মধ্যেও বিভেদ: রইল না। কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থা উৎপদনের জন্যে তিনি কোনও কথা বলেননি। 'রাণী রাসমণি নীচু কৈবর্ত জাতির মানুষ হিসেবে শূদ্র শ্রেণীর সদস্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজে দক্ষিণেশ্বরে পৌরোহিত্য করবার আগেই তার দাদা রামকুমারকে সেখানে একারণে পৌরোহিত্য ত্যাগ করতে বলেছিলেন যে কৈবর্তের মন্দিরে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ধর্মবিরোধী কাজ পরবর্তীকালে মন্দিরের সকল সম্পত্তি দেবোত্তর করে দেওয়া হলে তিনি সেখানে পূজারী হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু কৈবর্তের ভাত খেতে হচ্ছে বলে সারাজীবন আক্ষেপ করেছেন।

ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় ঠাকুর হরিচাদ ছিলেন সকলের থেকে ব্যতিক্রমী। কেন ব্যতিক্রমী? কেন স্বতন্ত্র? তারকচন্দ্র সরকার তাঁর জন্মকথা বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে ঠাকুর হরিচাঁদ হিন্দুধর্মের ঝর্ণাধারা আরও বড় করে আরও মহৎ করে নদীতে পৌঁছে দেবেন। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নিয়ে, বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে যা এতকাল 'সনাতন ধর্ম' নামে পরিচিত তিনি তাকে রূপ দেবেন 'সুদ সনাতন' ধর্মে। সূক্ষ সনাতনত্বের মধ্যে আছে এক গূঢ়গম্যতা না বুঝবার জন্যে সনাতনত্বের সীমা পেরিয়ে পৌঁছে যেতে হয় আরেক নতুন সীমানায়। কবির কথায়:

মানবকুলে আসিয়া, যশোবন্তসৃত হয়ে,
জন্মনিল সফলা নগরী।
প্রচারিতে গূঢ়গম্য, সুক্ষ সনাতন ধর্ম,
জানাইল এ জগৎ ভরি।।[13]

সূক্ষ সনাতন ধর্ম হল সেই ধর্ম যা সমাজের উপরের তলা ও নীচু তলাকে সমান করে দেখে সনাতনত্ব অর্জন করতে চেয়েছে এবং ভারতীয় সমাজকে বর্ণহীন করে দান করছে এক সাম্যের অমৃত সুধা।

রাজার তনয়েরা অস্পৃশ্য সমাজের মঙ্গল করেছেন এমন ইতিহাস কোথায়? মহারাজারা অস্পৃশ সমাজের প্রজাদের মঙ্গল বিধানে বহুবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তা তো কষ্টকল্প ভাবনা। প্রাচীন ভারতের কাল থেকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কাল অবধি পতিত সমাজের ইতিহাস একই ধারায় প্রবাহিত। ধর্ম হয়েছে শোষণের হাতিয়ার। ইতিহাস অগ্রগতির পরিবর্তে সৃষ্টি করেছে পশ্চাদ্‌গতি। প্রলেতারিয়েতদের হাতে ক্ষমতা না এলে শোষণ- মুক্ত সমাজের কল্পনা করা যায় না, এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন বিশ্বের বহু সমাজ- বিজ্ঞানী। কার্ল মার্কস, লেনিন, মাওসেতুং সহ আরও অনেকে। প্রাচীন ভারতে গৌতম বুদ্ধ-ও সেই একই ভাবনার বশে সামাজিক সমতা গড়তে চেয়েছেন পুজোপার্বণ, যাগযজ্ঞ সহ পুরোহিততন্ত্রের লম্বা হাত খাটো করে দিয়ে। আধুনিক সময়ে জ্ঞানবিচারি নববৌদ্ধিক চেতনার জন্ম দিয়েছেন ঠাকুর হরিচাঁদ। তাঁর জীবনীকার কি বললেন তাঁর কথা? কাঙাল হয়ে না জন্মালে কাঙালের মঙ্গল করা যাবে না যায় না।

তুমি ছিলে রামচন্দ্র জগতের মূল।
ফিরে বলে, 'এ গণনা হইয়াছে ভুল'।।
কর্মসূত্রে বুদ্ধ-জীবে উচ্চারি কেমনে।
কাঙাল হইব আমি তাহার কারণে।।[14]

রামচন্দ্র নয়, শ্রীকৃষ্ণ নয়, জন্মসূত্রে কাঙাল হয়ে জন্মাবেন একজন যিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নীচ হয়ে করবেন নীচে'র উদ্ধার।

ধর্ম-ইতিহাসের 'এনসাইক্লোপিডিয়া' অনুসরণ করে বলা যায় কোনও একটি ধর্ম 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম' হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে মূলত চারটি সর্ত পূরণ করে। সেই চারটি সর্ত হল—ধর্মটির একজন প্রতিষ্ঠাপুরুষ থাকেন, ধর্মটির থাকে নিজস্ব একটি দর্শন এবং ওই দর্শন-ভিত্তিক একটি সাহিত্য-ভাণ্ডার যা মূলত ওই ধর্মের নিজস্ব 'রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার' বলে কথিত। এবং ওই দর্শনের যথেষ্ট সংখ্যায় অনুগামী থাকেন। এই চারটি সর্তের কথা মনে রেখে 'মতুয়া ধর্ম'কে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলাদা ধর্ম বলতে কোন আপত্তি থাকে না—থাকার কথাও নয়। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের শরীর ভেঙে যেভাবে উত্থান ঘটেছে শিখ ধর্মের—ঠিক সেই একই

প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই মতুয়া ধর্মের নিজস্ব সত্তা গড়ে উঠেছে । ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে—যে-সব দেশে আলাদা ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে সেই সকল ধর্মের মানুষেরাও ভারতবর্ষে বাস করেন। সে কারনেই 'India is a country of religious diversity and religious tolerance is established in both law and customs, Throughout the histroy of India, religion has been an important part of the country's culture.'[15]

একেক ভাবে গণমানুষের কল্যাণের জন্য একেকটি ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। আভিধানিকভাবে ধর্মের সংজ্ঞাও প্রদত্ত হয়েছে সেই ভাবে। ধর্ম হল 'a particular system of faith and worship' অথবা 'anything done or followed with reverence or devotion. 'নতুন এক বিশ্বাস নতুন এক সাধনতত্ত্ব মতুয়া ধর্মে স্থান পেয়েছে। সে কারণেই ঠাকুর হরিচাদ বলেছেন:

'পূর্ণ আমি', সর্বময় 'অপূর্ণের পিতা'।
'সাধনা' 'আমার কন্যা 'আমি জন্মদাতা।[16]

'অপূর্ণের পিতা' এই কথাটা ঠাকুর হরিচাদ বললেন কেন? বাঙলার শূদ্র শ্রেণীর মানুষেরা অশিক্ষায় নিমজ্জিত, দারিদ্র্যে জর্জরিত এবং সামাজিকভাবে ঘৃণিত। তাদের জীবন এদেশের শিক্ষিত বিত্তশালী এবং সামাজিকভাবে গরিমাপূর্ণদের তুলনায় 'অপূর্ণ'। তিনি নিজেকে 'অপূর্ণের পিতা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পূর্ণ মানুষ complete man—তিনি অপূর্ণদের পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যাবেন এই ছিল জীবনের ব্রত—মহান সাধনা। পূর্ণত্বের মধ্যে পৌঁছাতে হলে যে-কাজ চাই, যে-সাধনা চাই—তিনি নিজে ছিলেন সেই সাধনার জন্মদাতা— তিনি নিজে সেই 'সাধনা' নামক কন্যাটির পিতা বলে দাবী করেছেন। মনে রাখা দরকার, অন্ধের যেমন দিনরাত্রি সমান তেমন লেখাপড়া-শূন্য মানুষ শূন্যের খাতাতেই তাদের স্থান। তাদের দ্বারা জাতি জাগ্রত হয় না। দেশও উন্নতির পথে যায় না।" ব্রাত্যজনগোষ্ঠীর উন্নয়নের স্বপ্নদর্শী ছিলেন ঠাকুর হরিচাদ। কেউ কেউ বলেন তিনি তো প্রবলভাবে ছিলেন ভক্তিমার্গের অধ্যাত্মবাদী। এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার, 'ধর্মের মর্মবস্তু শুধু অধ্যাত্মিকতা নয়। প্রকৃত ধর্মের সাথে, প্রকৃত আত্মিক উন্নতির সাথে এগিয়ে চলে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি। মতুয়া ধর্মের মুকুর শুধু আধ্যাত্মিকতারই ফল বহন করে চলে না, চলে সামগ্রিক উন্নতির। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন উন্নতির শিখরে থাকা মানুষদের উন্নয়নের কথা গৌণ হয়ে যায়, সমাজের তলানিতে থাকা মানুষের — ব্রাত্য মানুষের - অপাংক্তেয় মানুষের উন্নয়নের প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

ব্রাত্য জনগণের উত্থানের কথা মাথায় রেখে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'গৃহস্থের মূলভিত্তি অর্থনীতি বটে?" এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে চিরকালীন সেই সত্য 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী' তা-ও মাথায় রাখতে বলেছিলেন ঠাকুর হরিচাঁদ। তাঁর কাছে 'কর্ম'ই ছিল,সারাৎসার—উন্নয়নের চাবিকাঠি। এদেশের মুনিঋষিদের সাথে তিনি তুলনা করেছেন কায়িক শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে যে চাষী-সমাজ তাঁদের। মুনিঋষিরা কি করেন? "মুনিঋষি করে চাষ আর্য্য ব্যবসায়। তারা উৎপাদন করেন না—পরের উৎপাদনে ভাগ বসান—তারা পরজীবী। ঠাকুর হরিচাদ ছিলেন চাষী-ঘরের সন্তান। নিজে হাতে লাঙল ধরেন—নিজে হাতে 'একদিন চাষ করি প্রভু তা শিখায়'। যাঁরা পরের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে 'গড়া' নেই—আত্মনির্ভরতা তৈরি হয় না তাদের। বাঁচার জন্যে উকুবৃত্তিকে আকড়ে ধরতে হয় পেশা হিসাবে। তাদের কে লক্ষ্য করে

ঠাকুর হরিচাদ বললেন, 'তুমি স্কুল'। ঠাকুর নিজেকে দাবি করেন 'আমি সৃক্ষ' বলে। তিনি কেন এলেন এই পৃথিবীতে? কোন মহৎ কাজ তাঁর উপরে অর্পিত হয়ে আছে। কবিভাষ্যে মিলে যায় তার উত্তর:

নামধারী দেহরূপে তুমি হরিচাদ।
জীব-শিক্ষা লাগি নরজগতের নাথ।।[17]

ভাববাদের সাথে ভক্তিবাদের অবিমিশ্র মিলন ঘটিয়ে এক নতুন ধর্মীয় দর্শন তিনি মানব-সমাজকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ধর্ম দর্শনের অর্ধেকটা ভাববাদ এবং অর্ধেকটা বস্তুবাদ।

আধুনিক কালের মানুষ হয়েও তিনি পুরোটা বস্তুবাদী হলেন না কেন? যে ব্রাত্য সমাজে তিনি জন্মেছিলেন ধর্মের ঈশ্বরমুখিন ভাবনা এবং ভক্তিবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে কঠিন কঠোর বাস্তবের কথা বললে তিনি তাঁদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারতেন না এবং আরও জোর দিয়ে বলা যায় তিনি গ্রহণীয় হতেনই না - তাই ধর্মের মধ্য দিয়ে তাদেরকে তিনি বাস্তবমুখি করেছেন। সচেতন করেছেন অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়তে — বুঝতে শিখিয়েছেন নারীজাতিকে সম্ভ্রম জানাতে। যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ সহ নানা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যয়বাহুল্য বর্জন করে, পুরোহিততন্ত্রকে অস্বীকার করে এক সাদামাটা জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের নিপীড়িত ও বঞ্চিত ব্রাত্যজন জীবনে নতুন চেতনার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। ব্রাত্যজন জীবনের উত্থান সীমিত হলেও যেটুকু হয়েছে ঠাকুর হরিচাদ না জন্মালে তা-ও হত কিনা—এবং হত না একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

1) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ৫৫
2) নাবলী, চতুর্থ বিশ্বভারতী, পৃ. ৭১৮
3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ৩০১
4) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ২৬

5) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ 2 0
6) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ২০
7) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ১৮
8) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ২৩
9) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ২১
10) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ৩২৪
11) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ৩২৪
12) জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকল্প নবজাগরণ, ২০০৪, পৃ ৫৪
13) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ১২
14) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ১৩
15) এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন, www. religion. com
16) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ২৯
17) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ ৭৩